দৈনিক সংবাদ

34

তারিখ 13 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

নানা কৌশলে তৎপর ওরা।। সাধারণ ছাত্ররা বার বার রুখে দিচ্ছে ওদের

শিবির চক্রের টার্গেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শেষ পর্ব)

।। জিল্লুর রহমান খান/সুদীপ্ত দাস ।।

ময়মনসিংহ, ১২ই জানুয়ারি।- কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা বার বার প্রতিহত হবার পর ১৯৯৫-এ নতুন চাল দেয় ঘাতক-শিবির চক্র। এ কাজে তারা বেছে নেয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জামাতপন্থী কর্মচারী কর্ম-কর্তাদের (জামাতের কমান্ড অফিস বলে শোনা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার)।

১৯৯৪-৯৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পর্বে ভর্তি ফরম বিক্রির সময় সকল ছাত্র সংগঠনই চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসেছিল ভর্তি গাইড বিক্রি করতে। আবারো নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শিবির এ গাইড বিক্রির জন্য বসে। যথারীতি গাইড তারা বিক্রিও করছিল। তাদের এ উস্কানি গায়ে মাখেনি অন্যান্য সংগঠন। কিন্তু অপরাপর ছাত্র সংগঠনকে উস্কিয়ে দেয়ার জন্য শিবির ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একজন কর্মচারীর পুত্রকে। ঐ ছেলে শিবিরের গাইড 'সোনালিকা' ক্রয়ের জন্য ভর্তিচ্ছুদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে- এ প্রচারণায় অন্যান্য ছাত্র সংগঠন বাধা দিতে এলে প্রথমে বাকবিতন্ডা হয় যা পরবর্তীতে ছাত্র-কর্মচারী সংঘর্ষে রূপ নেয় এবং ৭ই ফেব্রুয়ারি কর্মচারীর পুত্র গাজীউর নিহত হয়। বন্ধ হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৮ই মার্চ খোলে। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মতেঃ শিবির গাজীউরকে পেছন থেকে গুলি করে হত্যা করে ও পরবর্তীতে সাধারণ ছাত্রদের দোষী করার চেষ্টা চালায়। সে সময় শিবিরচক্র সাংবাদিক সম্মেলনে গাজীউর হত্যাকান্ডের জন্য ছাত্রদলকে সরাসরি দায়ী করে, উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রঐক্যের শরিক সংগঠনসমূহকে ছাত্রদল থেকে আলাদা করা।

গাজীউর হত্যাকান্ডের পর থেকেই শিবির নিজেদের গুটিয়ে নিলেও ক্যাম্পাস দখলের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। সুযোগ এসেও যায়। চলতি বছরের ২৩শে আগস্ট থেকে ছাত্রদলের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ শুরু হয়। এর প্রেক্ষিতে ১৪ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় এবং ৪ঠা অক্টোবর খোলে। আর এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে শিবির।

৪ঠা অক্টোবর খোলার পরপরই শিবির ক্যাম্পাসে নিজেদের উপস্থিতি প্রমাণ করতে লিপ্ত হয়।

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে শিবির ক্যাম্পাসে উস্কানিমূলক শ্লোগানসহ মিছিল শুরু করে। এছাড়া বয়ড়া ও বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন শেষ মোড় এলাকায় উঠতি বয়সের যুবকদের দিয়ে ক্লাব ও সংগঠন করা এবং যুবকদের হাতখরচ যোগান দিয়ে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা চালায় শিবির। বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন কর্মচারীকে এ কাজে ব্যবহার করা হয়। একজন কর্মচারীকে পাঁচটি রিকশা কিনে দেয়া হয়। দরিদ্র কর্মচারীদের দেয়া হয় আর্থিক সাহায্য, এর বিনিময়ে ঐ সকল কর্মচারী ও তাদের আত্মীয়স্বজনের বাড়িগুলো পরিণত হয় শিবিরের গোপন আস্তানায়।

৭ই ডিসেম্বর ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্ব আবারো শুরু হয়। আর এ সুযোগেই ১৬ই ডিসেম্বর আঘাত হানার চক্রান্ত করে শিবির।

বাইরে থেকে হামলা করা ছাড়াও ভেতর থেকে সাহায্য পাবার জন্য শিবির আর একটি কৌশলের অবলম্বন করে। কৌশলটি ছিল 'তাবলীগ জামাত'-এর মাঝে ঢুকে পড়া। আর এ কাজটি শিবির করে প্রগতিশীল ছাত্রদের ঘাঁটি নাজমুল আহসান হল এবং ছাত্রদলের ঘাঁটি শামসুল হক হল, সোহরাওয়ার্দী হল ও ফজলুল হক হলে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, 'তাবলীগ জামাত' এর ভেতরে থেকে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সাংগঠনিক তৎপরতার খবর 'হাই কমান্ড'-এর নিকট পাঠাত শিবির কর্মীরা। ১৬ই ডিসেম্বর শিবির হিট করতে পারে তা শোনা যাচ্ছিল আগে থেকেই। ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকেই শিবিরের তৎপরতা ছিল একটু অন্যরকম। ১৫ই ডিসেম্বর রাত দশটা নাগাদ দুটো ইঞ্জিন-চালিত নৌকা এসে থামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশাখাঁ হল সংলগ্ন করিম ভবনের পেছনে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে। নৌকাগুলো থেকে বহিরাগত শিবিরকর্মীরা এসে অবস্থান নেয় ঈশাখাঁ হলের পূর্ব ভবনে। জামাল হোসেন ও শাহজালাল হলে আগে থেকেই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির কর্মীরা। পরিকল্পনা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী যখন শহীদ মিনারে যাবে তখন খালি হলগুলো বিনা বাধায় দখল করবে শিবির। কিন্তু একটু ভুল শিবিরের সকল হিসেব এলোমেলো করে দেয়।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ছাত্রদলের মিছিলে ককটেল নিক্ষেপ করে 'টেস্ট' করে ছাত্রদল প্রতিউত্তর করে কিনা। এ টেস্টটিই কাল হয় শিবিরের জন্য। জামাল হোসেন ও শাহজালাল হলে শিবিরকর্মীদের মাঝে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যও টের পেয়ে যায় শিবিরের উপস্থিতি। রাত ১২-০১ মিনিটে ছাত্রদলের মিছিলে আবারো ককটেল নিক্ষেপ করে শিবির। এতে জামাল হোসেন ও শাহজালাল হলের শিবির কর্মীরাও উত্তর দেয়। খবর আছে যে, ঈশাখাঁ হলের পূর্ব ভবনে অবস্থানরত বহিরাগত শিবির কর্মী এবং জামাল হোসেন ও শাহজালাল হলে অবস্থানরত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির কর্মীরা রাতে নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ চালিয়েছে।

বিস্ফোরণের শব্দে বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রকম্পিত তখন সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ শিবির প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। রাতের ও ভোরের কুয়াশা কেটে যাবার পর ছাত্রঐক্যের নেতৃত্বে সাধারণ ছাত্ররা যখন মিছিল সহকারে শাহজালাল হলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন শিবিরের গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেছে। শিবির তখন পলায়নের কথা চিন্তা করে এবং পেছন দিকে গুলি করতে করতে শাহজালাল জামাল হোসেন ও ঈশাখাঁ হল ছেড়ে ব্রহ্মপুত্র নদে রক্ষিত ইঞ্জিনচালিত নৌকাযোগে পালিয়ে যায়। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের দাবি অনুযায়ীঃ শিবির পলায়নের সময় সেমসাইড গুলিতে শিবিরের তিন নেতা নিহত হয়েছে। শিবির অবশ্য তিন কর্মী খুনের জন্য ছাত্রঐক্যকে দায়ী করেছে। তবে একথা ঠিক যে, শিবির বাইরে থেকে ক্যাডার আমদানি করেছিল। কারণ আহত অবস্থায় গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে শিবিরের মেডিক্যাল কলেজের নেতা জয়নাল আবেদীন টিটো। এছাড়া শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই আলাউদ্দিন নিহত হয়েছে বলে প্রথমে দাবি করে এবং পরবর্তীতে তিনজন নিহত হয়েছে বলে প্রচার চালাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অপর আলাউদ্দিন ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্র।

বন্ধ ঘোষিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও অবস্থান করছে শিবিরের নেতা-কর্মীরা। ইতিমধ্যে শিবির ক্যাম্পাসে প্রচুর বহিরাগত সমাবেশ ঘটিয়ে পুলিশের নাকের ডগায় ঘেরাও করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে, ঘেরাও হয়েছেন ময়মনসিংহ জেলার ডেপুটি কমিশনার পর্যন্ত। শিবির প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রঐক্য নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার না করলে বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে দেয়া হবে না। তথাকথিত তৌহিদী জনতা ছাত্রঐক্য নেতা-কর্মীদের বিচার করবে এবং তখন প্রশাসন শিবিরকে দায়ী করতে পারবে না বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শিবির শাসিয়েছে।

এছাড়া শিবির এখন আশ্রয় নিয়েছে ঢাকার সাথে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর ও শেরপুর জেলার মধ্যে বাস চলাচলের পয়েন্ট চরপাড়া মোড়ে। কোন এক জনসভায় শিবিরের এক নেতা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে 'আফগানিস্তান' বানিয়ে দেবার কথা পর্যন্ত বলেছেন বলে জানা গেছে।

রাজশাহী ও চট্টগ্রামের শিবিরের ক্যাডার বাহিনী ইতিমধ্যে বাকৃবি দখলের পরিকল্পনার জন্য ময়মনসিংহ ঘুরে গিয়েছে বলে জানা গেছে। এ অবস্থায় অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার ও বহিরাগত শিবিরের ক্যাডারদের যাতায়াত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বন্ধ না করে ক্লাস শুরু হলে বৃক্ষছায়া শোভিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ ক্যাম্পাস যে মতিহার চত্বর ও চট্টগ্রামের মতই শিবিরের আক্রমণে রক্তে লাল হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য।